অধ্যায় ১৪ : আধুনিক বাংলা গল্প পাঠ—৫

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৪.২ পরিচিতি

১৪.৩ লেখক পরিচতি

১৪.৪ 'আপট্রেন' গল্পের মূল সুর এবং চরিত্র

১৪.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১৪.৬ অতিরিক্ত পঠন

১৪.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১৪.৮ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- গল্পকার রমাপদ চৌধুরী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'আপট্রেন' গল্পটির গল্পশৈলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গল্পে উল্লিখিত চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এই গল্পে উল্লিখিত মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৪.২ পরিচিতি

আমাদের বুদ্ধিজীবী বা দুর্বুদ্ধিজীবীরা সারাদিনে একবারও 'বাঙালি' শব্দটা উচ্চারণ করেন কিনা সন্দেহ। সুখের কথা, প্রাদেশিকতার ছিটেফোঁটাও তাঁদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাদের আলাপে আলোচনায় 'মধ্যবিত্ত' শব্দটা প্রায় অব্যয়ের মতো অতি ব্যবহৃত। অথচ এই মধ্যবিত্ত মানুষটি কে? বর্ণচোরা বহুরূপীর মতই ইনি তো বহুরূপে সামনে এসে দাঁড়ান। তখন খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য কোন্ বর্ণটা এর খাঁটি।"

—এই মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনেরই অপূর্ব রূপকার হিসেবে নিঃসন্দেহে সুচিহ্নিত রমাপদ চৌধুরী। ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে পালাবদল ঘটতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকেই। যুদ্ধোত্তর দেশের সমাজ স্বাভাবিকভাবেই অস্থির। যুগসন্ধির সেই দোলাচলতা, অজস্র সংশয় জিজ্ঞাসা আর নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে শুরু হয় সমসাময়িক লেখকদের যাত্রা। মধ্যবিত্ত জীবনের অনন্য ভাষ্যকার রমাপদ চৌধুরী তাঁদেরই অন্যতম। বরাবরের মেধাবী ছাত্র রমাপদের বাড়ির কেউই সাহিত্যিক ছিলেন না। তবে বাড়ির সকলেই বিভিন্ন বইপত্র পড়তে ভালোবাসতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে এক দারুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিলেন রমাপদ। তাই পরিণত বয়সে পৌঁছে ফেলে আসা, দেখে আসা জীবন থেকে সাহিত্যের রসদ খুঁজে নিয়েছেন তিনি। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হারানো খাতা' (পর্ব ১৫)-য়

রমাপদ চৌধুরী নিজেই জানিয়েছেন— "বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকার নেশায় পেয়েছিল বলে যে মানুষ দেখার চোখদুটিকে বন্ধ করে রেখেছিলাম তা-ও নয়। শুধু 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসেই নয়, আমার পরবর্তীকালের উপন্যাসে, গল্পেও তাঁরা এসেছেন। হয়তো পটভূমি বদলে তাদের কলকাতায় নিয়ে এসেছি।"

নির্মাণ দক্ষতা, পরিপাটি বিন্যাস, বহুমুখী বিষয়, সাবলীল ভাষা অপরিসীম যত্নে সবকিছুকে বুনেছেন তিনি। সেই সঙ্গে ছিল জীবনের মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস। ১৯৪০ থেকে ২০০৪ রমাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্যের ব্যাপ্তি। এ কথা ঠিক, তাঁর গল্প বিশ্বের প্রথম দিকে আমরা দেখি রাঁচি পালামৌ হাজারীবাগ অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালদের, মুণ্ডাদের জীবনের ছবি। যদিও পরবর্তী কালে তিনি বেশিরভাগই লিখেছেন মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে। রমাপদ চৌধুরীর মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক গল্পগুলি মূলত কলকাতাকে নিয়েই। 'সেই বাঙালি বাবুটি' রচনায় স্বয়ং লেখক মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা দিচ্ছেন— "মধ্যবিত্তের প্রকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। না অর্থে, না শিক্ষায়, না পেশায়। যদিও বিত্তের বিচারে কেউ নিম্ন, কেউ উচ্চ। আসলে এই বাবু মানসিকতা ছাড়া মধ্যবিত্তের আর কোন সংজ্ঞা নেই। সাহেব হয়ে যাওয়ার পরও যে মানসিকতা ভিতরে ভিতরে থেকেই যায়। ছাত্রাবস্থায় যে ছেলেটি সিনেমা হলের সামনে ৭৫ পয়সার সুলভতম টিকিটের জন্য কিউ দেয়, একদা বেশ স্থূল বেতনের চাকরি পেয়ে সুসজ্জিত বউকে সঙ্গে নিয়ে সেই ব্যক্তিটিই ব্যালকনির দুর্মূল্য আসনটির শোভা বর্ধন করে। এই মধ্যবিত্তের এক ভাই যখন সসম্মানে বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে আসে, অন্য ভাই তখন গণ টোকাটুকিতে হাতপাকিয়েও সহাস্য মুখে ফেল করে। একই বাড়িতে পাওয়া যাবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর নকশাল, ধুতি পাঞ্জাবি এবং বুশশার্ট- চোঙা প্যান্টের সহাবস্থানও সেই মধ্যবিত্তের সংসারেই।"

১৪.৩ লেখক পরিচিত

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার রেল শহর খড়্গপুরে রমাপদ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। সময়টা ১৯২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর। রমাপদর দাদু ছিলেন খড়্গপুরের বি এন রেলওয়ে হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম হেডমাস্টার। বাবা তারা প্রসন্ন চৌধুরী ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র। সেই উনিশ শতকেই তাঁর ছ'জন পূর্বসূরী ছিলেন স্নাতক। রমাপদ যখন ছোট, তখনই তার ঠাকুরদা ও ঠাকুমা মারা যান। দাদুর পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তাই ঘনিষ্টতা ছিল বেশি। রমাপদ চৌধুরীর বাবা তারাপ্রসন্ন শ্বশুর মশাইয়ের আদর্শে ও সান্নিধ্যে বড় হয়েছিলেন। ছেলেবেলা এবং কৈশোরের অনেকটা সময় রমাপদ চৌধুরীর কেটেছে নিঃসঙ্গতায়। নিজের স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন "দুঃখী বালকটি কোথাও সঙ্গী খুঁজে না পেয়ে একা একা অনেকদূর চলে যেত খ্রিস্টানদের শান্ত সুন্দর সমাধি ক্ষেত্রে, চাঁদমারি ময়দানে হিজলীর বনের বিশাল বিশাল গাছের ছায়ায় ভেজা গ্রামটিতে কখনও সাইকেল চালিয়ে চলে যেত সুদূর কংসাবতীর জলে পা ডুবিয়ে চুপচাপ বসে থাকার জন্যে। সে সব সময় কেউ না কেউ তার সঙ্গে থাকতো। কিন্তু সঙ্গী থাকতো না।" অসহযোগ আন্দোলন যখন চলছিল রমাপদ তখন নিতান্তই কিশোর। সারাদেশে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তবে কিশোর রমাপদর জীবনে যে দুটি ঘটনা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে সে দুটি হলো 'সূর্যাস্ত আইন' এবং 'সাইকেল নিষিদ্ধ হওয়া'। নিজেকে তার অনেকটা

বন্দী মনে হচ্ছিল। এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতেই তিনি বইয়ের পাতায় আশ্রয় নেন। স্কুলের লাইব্রেরিতে বেশিরভাগ বই ছিল ইংরেজি। অন্যদিকে বাংলা বই তখন "মাস্টার মশাইদের চোখে একটা নিষিদ্ধ জগৎ।" বয়:সন্ধির সেই সময়টায় ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা তারাপ্রসন্ন,"আনন্দমঠ পড়েছিস তুই? ..... একটা চাবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়বি। খুব ভালো বই। বললেন, চাবিটা তোর কাছেই থাক।"১৯৩৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষা পাস করে রমাপদ ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। 'মাসিক বসুমতি'র সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক ছিলেন তার সহপাঠী। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব সে সময় থেকেই। এই দুই বন্ধুর অনুরোধেই কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে একটা রেস্তোরায় বসে রমাপদ লিখে ফেললেন তার জীবনের প্রথম ছোট গল্প— 'ট্র্যাজেডি'। 'আজকাল' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। তারপর 'বনপলাশীর' 'পদাবলী', 'লালবাঈ', 'দরবারী', 'লাটুয়া ওঝার' কাহিনি কিংবা দ্বীপের নাম টিয়ারং-এর মতো অনন্য সাধারণ সব সৃষ্টি। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রয়েছে একাধিক প্রবন্ধের বই, স্মৃতিকথা এবং একটি অত্যাশ্চর্য ছড়ার বই। তিনিই একমাত্র ভারতীয় লেখক, যাঁর গল্প সংকলিত হয়েছে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত লিটারারি ওলিম্পিয়ানস গ্রন্থে। অনুবাদ করেছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনটন বি সিলি। রমাপদ চৌধুরী মূলত কলকাতার গল্পই লিখেছেন, মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প। হয়তো তাই ১৯৭০ এর দশকে নতুন রাজনৈতিক দর্শনের মুখোমুখি বাঙালি সমাজ জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া সিনেমার আখ্যানকার হয়ে ওঠেন তিনি। মৃণাল সেনের 'খারিজ' কিংবা 'একদিন অচানক' তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। তপন সিংহের পরিচালনায় 'এক ডক্টর কি মৌত' সিনেমাটি তৈরি হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'অভিমন্যু' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করেই। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এমএ করার পর তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদনা করতেন। ১৯৫৪ সালে 'প্রথম প্রহার' উপন্যাসের মাধ্যমে রমাপদ বাংলা সাহিত্য জগতে আলোড়ন ফেলে দেন। পাঠক মহলে ভীষণভাবে আদৃত হয় ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'বনপলাশের পদাবলী'। সাপ্তাহিক দেশ ও শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় রমাপদ চৌধুরী লিখতে শুরু করেছিলেন ২৫ বছর বয়স থেকেই। তাছাড়াও 'ইদানিং' এবং ' রমাপদ চৌধুরী পত্রিকা' নামে তিনি দু'টি পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলস্বরূপ মানুষের উদ্বাস্তু হওয়া, দেশভাগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্বন্তর, নৈতিক বিপর্যয় গভীর ছাপ ফেলে ছিল লেখকের মনে। স্বাধীনতা পরবর্তী মানুষের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, জনতার রোষ, নানা রকম আন্দোলন, রাজনৈতিক উত্থান পতন, মধ্যবিত্তের বিকাশ এ সমস্ত কিছুরই সাক্ষী তিনি। তাঁর সাহিত্যে তাই স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার দোলাচল, অনিশ্চয়তা, হতাশা, প্রতারণা ইত্যাদি। তাঁর ৪৯ টি উপন্যাসের বেশিরভাগই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কেন্দ্র করেই রচিত। এমনকি গল্পসমগ্রের অন্তর্গত ১৪৪টি ছোটগল্পের মূল সুর মধ্যবিত্তকে নিয়েই। অন্ত্যজ আদিবাসী সমাজকে নিয়েও রয়েছে তাঁর প্রচুর রচনা। আমাদের মনে রাখতে হবে রমাপদ চৌধুরী জীবনের ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত শুধু ছোটগল্পই লিখেছেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত । তিনি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন ১৯৫৪ তে। ১৯৮৫'র পর থেকে তিনি কোনও গল্প আর লিখেননি। গল্প সম্পর্কে 'গল্পসমগ্র' গ্রন্থে লেখক স্পষ্ট বলেছেন, 'রণক্ষেত্রের দামামা বেজে উঠল। লক্ষ লক্ষ সিপাহি, সান্ত্রী, অশ্বারোহী সৈনিক ছুটে এল উন্মত্ত আক্রোশে। বিপরীত দিক থেকেও ঝাঁপিয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা।

এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ, এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির। ঔপন্যাসিক তখন কোনও মিনারের চূড়ায় উঠে নোটবুকে টুকে নেবেন সমস্ত দৃশ্যটা। রাজার অঙ্গে লাল মখমলের পরিচ্ছদ, মাথার মুকুটে মণি মুক্তা হীরের জ্যোতি, সেনাপতির দুঃসাহসিক অভিযান, অন্যদের চিৎকার, এসবের একটা কথাও বাদ দেবেন না ঔপন্যাসিক। লিখে নেবেন কতকগুলো হাতি, কত ঘোড়া এ যুদ্ধে যোগ দিল। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বর্ণনা ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে নেবেন তিনি। যুদ্ধজয়ের পর সৈন্যদল দেশে ফিরবে যখন, তখনও পিছনে পিছনে ফিরবেন ঔপন্যাসিক। শঙ্খধ্বনি, আর সমারোহের আনন্দ ছিটিয়ে আহ্বান জানাবে প্রবীণা আর নগরকন্যার দল। তাও লিখবেন ঔপন্যাসিক, বর্ণনা দেবেন তাদের, যারা উলুধ্বনির আড়ালে কলরব করে উঠল। তারপর? তারপর হঠাৎ তিনি ছোটগল্প লেখককে দেখতে পাবেন পথের ধারে, একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন উদাস দৃষ্টিমেলে। এ কোন উন্নাসিক লেখক? - মনে মনে ভাববেন ঔপন্যাসিক। কোনও মিনারের চূড়ায় উঠল না, দেখল না যুদ্ধের ইতিবৃত্ত, শোভাযাত্রার সঙ্গ মিল না, এ কেমন ধারা সাহিত্যিক। হয়তো এমন কথা বলবেনও তিনি ছোটগল্প-লেখককে। আর তখন, অত্যন্ত দীর্ঘ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ চেয়ে তাকাবেন ছোটগল্পের লেখক, বলবেন হয়তো, না বন্ধু, এসব কিছুই আমি দেখিনি, কিছুই আমার দেখার নেই। শুধু একটি দৃশ্যই আমি দেখেছি। পথের ওপারের কোন গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন তিনি, যেখানে একটি নারীর শঙ্কাকাতর চোধ সমগ্র শোভাযাত্রা তন্নতন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে। চোখের কোণে যার হার ফুটে উঠেছে কে যেন ফেরেনি, কে একজন ফেরেনি। ছোটগল্পের লেখক সেই ব্যাথা-বিন্দুর, চোখের টলমল অশ্রুর ভেতর সমগ্র যুদ্ধের ছবি দেখতে পাবেন, বলবেন হয়তো, বন্ধু হে, এই অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই আমার অনন্ত সিন্ধু।"

জেনে রাখুন

"ভালো লেখার একটা মোহ আছে। এই মোহের বশেই অনেক সময় অনেক লেখক ভুলে যান, জীবনযাপনের যেমন একটা আয়ু আছে, সৃষ্টিশীলতারও একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধা রয়েছে। আর ভুলে গিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে লিখে যেতে থাকেন। আর সেই লেখাগুলো তাঁরই একটা কদর্য রূপ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্রুপ করে তাঁকেই। রমাপদ চৌধুরী জানতেন যেমনভাবে শুরু করার একটা সময় থাকে, থামারও একটা সময় থাকে। একজন লেখকের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর যে তিনি শেষ হয়ে গিয়েছেন । তার আর নতুন কিছু দেওয়ার নেই। আর সেটা মানতে না পেরেই অপাঠ্য কুপাঠ্য লিখে চলেন । কিন্তু এই বাস্তবটা মেনে নিতে পেরেছিলেন রমাপদ চৌধুরী।"

১৪.৪ 'আপট্রেন' গল্পের বিষয়বস্তু:

স্বার্থলোভী মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের অবস্থানে সবসময় অনড় থাকতে চায়। সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন সে যে বুঝতে পারে না তা নয়। তবুও প্রতিবাদ, সহানুভূতি সবটুকু বাদ দিয়ে, এমনকি নিজের মনুষ্যত্বকে মেরে ফেলে সে জীবনে সফল হতে চায়। এমনই একটি গল্প 'আপট্রেন। 'উত্তম

পুরুষে লেখা গল্পটিতে রয়েছে বর্তমান সময়ের ইঁদুর দৌড়ের কথা। উত্তম পুরুষের ব্যবহার প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ: ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প' গ্রন্থে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন, "ছোটগল্পে উত্তম পুরুষের নিরীক্ষণ বিন্দুর আরেকটি লক্ষ্যবস্তু, বলাবাহুল্য, বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি। কারণ কোন ব্যক্তি যখন একটি কাহিনিকে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা রূপে বিবৃত করে তখন তা পাঠকের কাছে যত সহজে বিশ্বাস হয়, অন্যের কাহিনিকে সর্বজ্ঞ ভঙ্গিতে বললে অবশ্যই তা হয় না।.... সর্বজ্ঞ লেখকের সঙ্গে পাঠকের যে সম্ভাব্য দূরত্ব তা অনেকটাই কমে আসে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগে।" একসময়ের আদর্শবাদী নায়ক উপলব্ধি করে জীবনে সততার মূল্য আর নেই। তোষামোদ করা, পাইয়ে দেওয়া, বিকিয়ে যাওয়া রাজনীতির যুগে দাঁড়িয়ে তার মনে হয় তার মেরুদণ্ড আর সোজা নেই। কারণ জীবন যুদ্ধে টিঁকে থাকার জন্য চাকরির প্রত্যাশায় তাকেও প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে নতজানু হতে হয়। মাথা নিচু করে শুনতে হয় তার উপদেশ বাণী। রমাপদ চৌধুরী আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই মানুষ। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, "আসলে আমি নিজেকেই সবচেয়ে বেশি চিনি। আমার পরিবারের লোকদের, আত্মীয়-স্বজনকে আমার সহকর্মীদের। ভিড়ের মধ্যে ট্রামে, বাসে, পুজো মণ্ডপে, বিয়ের আসরে সর্বত্র আমি তো আমাকেই দেখছি।" বিবেক চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "নিজেকে চেনার চেষ্টা করলাম। তাদের ঈর্ষা লোভ সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ভালো থাকতে না পারার বেদনা, হেরে যাওয়া, জিতে যাওয়া— এ সবই চোখে পড়লো। তাই দূর থেকে দেখা জিনিস কল্পনায় সাজিয়ে আর লিখতে ইচ্ছে করলো না। আমার যেটুকু কল্পনা শক্তি তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লো।" গল্পে আমরা দেখি, অনেক চেষ্টা, অনেক টানাপোড়েন আর অজস্র দরজায় দরজায় ঘুরে ফেরার পর গল্পের নায়ক 'আপট্রেন'-এ উঠে বসে। ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে ওঠার জন্য যাত্রীদের চিৎকার, হট্টগোল। এক ফালি সিটে বসার জন্য কী সাংঘাতিক রেষারেষি। গল্পের নায়ক প্রথমে বসার কোনও সিট পায় না। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যদি কোথাও বসা যায়। একসময় সে বসার সুযোগও পায়। তারপর সে জানালার পাশের সবচেয়ে ভালো সিটটার দখল নিতে চায়। যেটা দখল করার জন্য চূড়ান্ত অভদ্র হতেও তার কোন আপত্তি নেই। আসলে এটাই বর্তমান সমাজের নির্মম সত্য— "আমরা মশাই কেউই হোমো স্যাপিয়ন নই, যতই খাড়া হয়ে দাঁড়ান, মাথা উঁচু করুন। সেই বিজ্ঞ লোকটি একদিন বলেছিলেন, ভেতরে ভেতরে আমরা তো প্রতিমুহূর্তে চতুষ্পদ হয়ে যাই, কখনও কখনও সরীসৃপ। মিথ্যে কথা। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি না। আমি ওই জানলার পাশের সীটটা পেলে দেখিয়ে দিতে পারি আমার স্পাইনাল কর্ড এখনো লাঠির মত সোজা। তখন আমি আর কাউকে কনুইয়ের গুঁতো দেব না, ভারি জুতো দিয়ে কারও পা মাড়িয়ে দেব না, ভিড়ের মধ্যে নিজের জন্য একটু বেশি জায়গা করে নিতে চাইব না।"

গল্পের শেষে আমরা দেখি সে তার কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তাকে ভালোবাসার, তার সঙ্গে কথা বলার কেউ কোথাও নেই। সে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ, "আমি ধোঁয়াটে আলোর প্লাটফর্মের উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি সোজা হয়ে হাঁটতে পারছি না। সমস্ত শরীরটা যেন দুপায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমি কেমন সামনে ঝুঁকে পড়ে নুয়ে পড়া একটা ভারি মেরুদণ্ড্ বয়ে নিয়ে চলেছি, একা এবং সম্পূর্ণ একা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'আপট্রেন' গল্পটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

জেনে রাখুন

"গঠনশৈলী ও রচনার দিক থেকে 'চাবি', 'আপট্রেন বা 'বড়বাজার' গল্প তিনটির প্রকৃতি একেবারেই স্বতন্ত্র। রমাপদ-র গল্পের প্রত্যাশিত সারল্যের পরিবর্তে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে পরাবাস্তবতা।"

১৪.৫ 'আপট্রেন' গল্পের মূলসুর এবং চরিত্র

মধ্যবিত্তের জীবন ও মনের অপূর্ব ভাষ্যকার রমাপদ চৌধুরী। ছেলেবেলাতেই প্রায় গোটা ভারতবর্ষ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি তার বাবার রেলের চাকরির সুবাদে। 'ঋষি, দস্যু, এক কিশোর বালক' স্মৃতিকথায় লেখক জানাচ্ছেন, "প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ইতিহাসের স্বাক্ষর খুঁজে বেড়ানোয় আমার তত আগ্রহ ছিল না, আমার ভালো লাগতো বিচিত্রমানুষগুলোকে বর্তমান পণ্যনির্ভর জীবনে মূল্যবোধ এবং মানবিক সম্পর্কগুলি তলিয়ে যেতে বসেছে। মানুষ, সে নিম্নবিত্ত হোক বা মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চবিত্ত, তার চাহিদার কোনও শেষ নেই। 'আপট্রেন' গল্পটির মূল এটিই। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে মধ্যবিত্ত এক যুবক, যে গল্পের কথক। এ প্রসঙ্গে শম্পা চৌধুরী 'রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "কাহিনি বয়নে এবং উপস্থাপনে রমাপদ-র সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিরীক্ষাস্থল অবশ্যই কথক আমি-র বয়ানে উপস্থিত গল্পগুলি।"

গল্পের কথকের উচ্চাশা প্রচুর। লক্ষ তার একটিই জীবনে সফল হতেই হবে। অথচ সে জানেনা কীভাবে, আমি স্টেশনের রাস্তা চিনতাম না।..... রাস্তাগুলো সবই আঁকাবাঁকা।" সুযোগ যে সে পায়নি বা চেষ্টা করেনি,তা নয়। কিন্তু বাস্তবের অলিগলি ঘুরে 'লক্ষরূপী' স্টেশনে সে পৌঁছুতে পারেনি কিছুতেই। সারাক্ষণ তার একটাই চিন্তা, "এ ট্রেনটাও যদি ফেল করি.....।" এক ভদ্রলোকের সুপারিশ করা চিঠি নিয়ে সে মুখার্জির কাছে যাবে বলে তার বাড়িতে এসেছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তোষামোদ, যদি কাজটা হাসিল করা যায়, "আমার ব্যবহার, আমার আচার যাতে একটুও আচরণআমার কথাবার্তা-বেফাঁস হয়ে না যায় সেজন্যে আমি ভিতরে ভিতরে সেগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ঢালাই এবং পালিশ করে খুব সচেতন যত্নে তার সামনে একে একে মেলে ধরছিলাম।" এইসব ধরাধরি, বাঁধাবাঁধির জীবনটা তাকে মেনে নিতে নিতে, "খেয়ালই নেই যে মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে।" সময়, সমাজ তাকে শিখিয়েছে যেভাবেই হোক সাফল্য চাই, "আমি কুড়িয়ে নিতে পারলেও এখন ধন্য হয়ে যাই।" ভদ্রলোক যখন তাকে বললেন, "ইয়াং মানি ইমপপেশেন্ট, তোমাদের একটুও ধৈর্য নেই। কিন্তু সাকসেসের গোড়ার কথাই জানবে পেশেন্স" তখন তার একটুও ভালো লাগেনা। চারপাশে কী হচ্ছে বা মানুষের ইমোশন অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পৃথিবীর সৌন্দর্য মন নেই তার কিছুতেই। সে দৌড়াচ্ছে 'সাকসেস রূপী' ট্রেন ধরার জন্য, "আমাকে ট্রেন ধরতে হবে, আমি অনেকগুলো ট্রেন ফেল করেছি..... কখনও একে ওকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে আমি সিঁড়িগুলো দু-তিন ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। "গল্পের নায়ক

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে যে মরিয়া, মাঝে মাঝে যার ঝুমঝুমির সঙ্গে পার করা সময় গুলো মনের ভিতর উঁকি দেয়, সে জানে এ দৌড়ে সেই একমাত্র নয়। রমাপদ লিখছেন, "কিন্তু প্ল্যাটফর্মে এত লোক। আমি জায়গা পাবো তো। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় আমার বুক দুরু দুরু করে উঠলো। "জীবনে হাঁটাটাই বড়ো কথা, পৌঁছানো নয় এটা সে মানতে নারাজ। 'আপট্রেন' একটি ট্রেন জার্নিরই গল্প। কিন্তু ব্যঞ্জনায় এমন একটি জীবনকে তুলে এনেছেন লেখক, যেখানে মানুষের চাহিদার কোনও শেষ নেই, "আমি একজনের পা মাড়িয়ে দিলাম,..... আরেকজন আমার পা মাড়িয়ে দিলো। আমি তাকে একটা ক্রুদ্ধ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। একজনের কনুই আমার নাকে লাগছিল, আমার কনুই আরেকজনের নাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পরস্পরের শত্রু হয়ে গেলাম। আমরা প্রত্যেকে প্রাপ্যের চেয়ে একটু বেশি জায়গা নেবার চেষ্টা করছিলাম।" যে লোকগুলো জীবনে সফল, পেয়ে গেছি অনেক কিছু, তাদের কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছি না আমরা। তাদের এই আরাম আমাদের চক্ষুশূল। গল্পের নায়কেরও। সে এগিয়ে যায় সিটের দিকে একটু একটু করে। যদি কেউ নেমে যায় পরের স্টেশনে। সে কৌশলে প্রায় পুরো শরীরটাই এমনভাবে সিটের সামনে হেলিয়ে রাখে যাতে ব্যূহ ভেদ করে কেউ সেটার দখল নিতে না পারে। সমাজে উপকারীর উপকার কেই বা মনে রাখে! গল্পের যুবকটিও নির্বিকার মুখে সেই ভদ্রলোককে চাপ দিতে থাকে যিনি ভদ্রতাবশত নিজে কষ্ট করে তাকে বসার জায়গা করে দিয়েছিলেন। আসলে মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই গল্পের যুবকটিকেও দেখি, "আমি শুধু একটু বসতে চেয়েছিলাম, একটা শুধু আসন, একটা সীট। এখন আমার পাখার হাওয়া চাই। তাই সামনের বেঞ্চের লোকটার উপর যার দিকে পাখাটা ঘোরানো ছিলো তার উপর ঈর্ষা হলো। এবং মনে মনে বলছিলাম ওই সীটখানা আমার চাই। ওখানে আনন্দ অনেক বেশী এবং আরাম। এবং স্বচ্ছলতা। এবং গর্ব।" এই আরাম আর স্বচ্ছলতা পাওয়ার জন্য আমাদের উচ্চাশা আমাদের নিরন্তর তাড়া করে। এতখানি ওপরে উঠতে গিয়ে হয়তো বা অনেক সম্পর্কেও ইতি টানতে হয়। 'আপট্রেন' গল্পের যুবকটিও ভেবেছিল 'লক্ষে' পৌঁছে যাওয়ার পর সে পরম নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবে। কিন্তু আদতে তা হলো না। কারণ, ছলে বলে কৌশলে নিজের লক্ষস্থানে পৌঁছুতে গিয়ে সে হারিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীকে। তাকে ভালোবাসার, তার প্রতি সমবেদনা জানাবার কেউ কোথাও নেই। সে ভীষণ একা এবং শূন্য, "আমার সমস্ত বুক খাঁ খাঁ করে উঠলো। আমার কান্না পেলো। মনে হলো একটু করে এইখানে পৌঁছতে গিয়ে আমি সবাইকে হারিয়ে ফেলেছি। সামনের বেঞ্চের সেই সুশ্রী মেয়েটিও একটু আগে কখন নেমে গেছে..... ঝুমঝুমি তুমি আজ কোথায়? সমস্ত লোক একে একে কখন যেন নেমে গেছে। আমার জীবন থেকে। আমি একা, একা।" 'চাবি', 'বড়বাজার' ও 'আপট্রেন'— এই তিনটি গল্পের আঙ্গিক জুড়েই রয়েছে গতিময়তা। এই গতিময়তা বর্তমান সময়ে ইঁদুর দৌড় ছাড়া আর কিছুই নয়। 'চাবি' গল্পে এই গতি প্রজন্মের ব্যবধানকে চিহ্নিত করেছে।গল্পের কথক 'আমি'র গতিময় চেতনায় ডুবে আছে অপারদর্শিতা। তবে সে জানে না সে কোথায় যেতে চায় অথবা কী করতে চায়। 'বড়বাজার' ও 'আপট্রেন' গল্পে ফুটে উঠেছে বর্তমান সমাজের অবক্ষয়। যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই বলেই মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এভাবে বেঁচে থাকতে। ভালো মন্দ, পাপ পুণ্যের ভেদাভেদও আমরা ভুলে গেছি অনেকদিন। রমাপদ চৌধুরীর 'আপট্রেন' গল্পটি আমাদের এখানেই নাড়া দিয়ে যায়," ভাবো ভাবো। অন্তত ভাবাটা একটু প্র্যাকটিস করো।"

১৪.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- গল্পকার রমাপদ চৌধুরী সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- 'আপট্রেন' গল্পটির গল্পশৈলী সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- গল্পে উল্লিখিত চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- এই গল্পে উল্লিখিত মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে জানতে পারলেন।

১৪.৭ অতিরিক্ত পঠন

- গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ (২০১৪) ছোটগল্পের সীমারেখা; কলকাতা : দে'জ
- ঘোষ বিনয় (২০১৪) মেট্রোপলিটন মন-মধ্যবিত্ত-বিদ্রোহ; কলকাতা : দীপ প্রকাশন
- চৌধুরী ভূদেব (১৩৭২বঙ্গাব্দ); বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- দাশ শিশিরকুমার (২০১২); বাংলা ছোটগল্প; কলকাতা : দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৯) কালের পুত্তলিকা; কলকাতা : দে'জ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (১৪১৭বঙ্গাব্দ) ছোটগল্পের প্রতিবেদন; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ভট্টাচার্য তপোধীর (২০০৬); প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; কলকাতা : দে'জ
- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ); দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য; কলকাতা : দে'জ

১৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: স্বার্থলোভী মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের অবস্থানে সবসময় অনড় থাকতে চায়। এমনই একটি গল্প 'আপট্রেন।'.....উত্তম পুরুষে লেখা গল্পটিতে রয়েছে বর্তমান সময়ের ইঁদুর দৌড়ের কথা। .....গল্পে আমরা দেখি, অনেক চেষ্টা, অনেক টানাপোড়েন আর অজস্র দরজায় দরজায় ঘুরে ফেরার পর গল্পের নায়ক 'আপট্রেন'-এ উঠে বসে। ..... কিন্তু তাকে ভালোবাসার, তার সঙ্গে কথা বলার কেউ কোথাও নেই। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১৪.৪ অংশ)

১৪.৯ আর্দশ প্রশ্নাবলি

১। 'আপট্রেন' গল্পে যে মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি রয়েছে, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

২। 'আপট্রেন' গল্পে যে গতির কথা রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করুন।

৩। গল্পের কথক চরিত্রটি আলোচনা করুন।

৪। 'আপট্রেন' গল্পটির অন্যতম চরিত্র সময় আলোচনা করুন।

*** *** ***